পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে লোকজীবন

আমাদের নির্ধাচিত সংকলনে স্থান পেয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার লোকনাটক। এই লোকনাটকগুলিকে বলা যেতে পারে উত্তরবঙ্গের লোকজীবনের দর্পণ। মহাকাব্য, পুরাণ, লৌকিক, কাল্পনিক ও বর্তমান — বিষয়ের কিছুর কাহিনীকে অবলম্বন করে তৈরী এই সলক লোকনাটক। প্রত্যেকটি লোকনাটকে দেখা যায় লোকজীবনের ছাপ। বলা বাহুল্য কাহিনীগুলো লোকায়ত সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কোচবিহারের 'কুশান' লোকনাটক রামায়ণের কাহিনীকে অবলম্বন করে তৈরী। দোয়ারী বা বৈরাগী সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে কথা বলেন। তখন সেখানে ফুটে ওঠে লোকজীবনের ছবি। কুশান নাটকে দোয়ারী বা বৈরাগী রাবণের মামা কালনেমি সেজে লঙ্কার অর্দ্ধেক ভাগের পরিকল্পনা করছেন—

"হা-হা-হা বেটা ঠিকে কুম্ভীরাণীর প্যাটোত গেইচে। কেমন বেটা ঘরপোড়া (হনুমান)। হা-হা-হা, যাঁও এ্যালা মুই রাবণের গোচর। লঙ্কা অর্দ্ধ ভাগ করি লইব সত্বর। দড়ি ধরি লইব ভাগ উত্তর দক্ষিণে। পূর্ব দিকে লব ভাগ না যাব পশ্চিমে। রাণীগণ আছে যত স্বর্ণ বিদ্যাধরী। তার অর্দ্ধ লব যেই ভাগে মন্দোদরী।"

লঙ্কা সাম্রাজ্য দড়ি দিয়ে ভাগ করা সম্ভব নয়। আসলে পারিবারিক জীবনের সম্পত্তির ভাগ বুঝে নেওয়ার কথা কালনেমির উক্তিতে মেলে। কালনেমি তখন লঙ্কা-অধিপতি রাবণের মামা নন। 'কুশান' পালানাটকের চারদিকের মানুষের সাধারণ প্রতিনিধি মাত্র। ঠিক এরকম আমরা দেখতে পাই 'রাজধারী' লোকনাটকে। কালনেমি এখানেও দড়ি দিয়ে লঙ্কা ভাগ করে নিতে চান। পাট দিয়ে তৈরী হয় দড়ি। শুধু পাট নয় দেখতে পাই তামাকের ব্যবহার 'রাজধারীতে'। মারীচ রাবণকে তামাক সেবন করতে বলেছেন।

মারীচ — "ইহি ভাগিনারে দশানন। আইস আইস ভাগিনা বস রত্ন সিংহাসনে ত্রিফুল তামাকু মোর করহ ভক্ষণ রে।"

আবার রাবণ তরণী সেনকেও একই কথা বলছেন। তরণী সেনকে যুদ্ধে পাঠানোর সময় রাবণের কথা — "ওরে পুত্র মোরে তরণী আইস আইস পুত্র মোরে বইস রত্ন সিংহাসনে। ত্রিফুল তামাকু মোর করহ ভক্ষণে পুত্র মোরে তরণী।"

উত্তরবাংলার কোচবিহার জেলা তামাক চাষের জন্য বিখ্যাত। পার্শ্ববর্তী জলপাইগুড়ি এবং খড়িবাড়ীতেও এর প্রচলন। কৃষকদের বাড়ীতে কলাগাছের চাষ নানা কারণে করা হয়। পূজাপার্বণ, খাদ্য এবং বাজারে বিক্রির

জন্য কলা চাষ দেখা যায়। আবার এই এলাকায় কলাগাছ পুড়িয়ে ক্ষার তৈরী করা হয়। লবণের বিকল্প হিসাবে ক্ষারের ব্যবহারের প্রচলন এক সময়ে ছিলো। 'বিষহরি' লোকনাটকে চাঁদ তাই তাঁর বাগানের কলাগাছ নষ্ট করতে চান না। চাঁদের চরিত্রে গ্রামের কৃষিজীবী যে মানুষ অভিনয় করতেন তাঁর মুখ দিয়ে লোকজীবনের সত্যরূপটি ধরা পড়েছে —

কেলা বেচাম আনা আনা
মচকা দেড় বুড়ি
তাক খায়া বাচিম হামরা
দুই বুড়াবুড়ি
বুড়া হমো বৃদ্ধ হমে'
লবণ কোথায় পামো
পুড়িয়া কেলার মুড়া তাকে 'ক্ষার'খামো।

কলাগাছ এবং কলাপাতা উভয়েরই বিভিন্ন পূজা-পার্বণে যথেষ্ট প্রয়োজন। বাস্তু পূজাতে কলাগাছের ব্যবহার সম্পর্কে জানা যায় — "বাস্তু ঠাকুরের থানের সম্মুখে চারিটি, প্রতিঘরের দরজার সম্মুখে দুইটি, দেবস্থানগুলির প্রত্যেকটি ঘরের সম্মুখে দুইটি করিয়া কলার গাছ পুঁতিয়া মাটি সুন্দরভাবে লেপিয়া দেওয়া হয়।"[১]

কৃষকদের ফসল উৎপন্নের কথাই শুধু নয়। গ্রামের কারিগর যাঁরা আছেন যাঁদের রুরাল আর্টিসান বলা হয় তাঁদের তৈরী শিল্প-দ্রব্যের কথা বলা দরকার। খড়িবাড়ী নকশাল বাড়ী অঞ্চলে রাজধারী পালানাটকের মুখোশ তৈরী গ্রামীণ কুটীর শিল্পে পরিণত হয়েছে। 'রাজধারী'তে রাবণের দশমাথাসহ লংকার সবচরিত্রগুলির মুখোশ রয়েছে। এ-গুলি তৈরী করার জন্য গ্রামীণ শিল্পীরাই নিয়োজিত। পাশাপাশি এই মুখোশগুলোকে আলাদাভাবে বিক্রিরও ব্যবস্থা থাকে। শাড়ীতে নানারকমের পাখীর ছবি আঁকতেন তাঁত শিল্পীরা। দোতরা পালা 'আলম সাধুতে' এরকম কথা 'ধাইমা'র কাছে শুনতে পাই —

"বেগমকে ধাইমা বলছেন —
তোমার ঐ শাড়িখান পিন্দিয়া
মুই তোমার নিদান তড়াইম।
আর ঐ শাড়িখানত যত রাজ্যের পংখী পয়াল দেকং মোক ভাঙ্গি কনতো।"

ঘর-বাড়ী তৈরীতে বাঁশের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। 'আলম সাধু লোকনাটকে' রহিম 'টং'-এ (উঁচু তক্তপোশে) ঘুমোচ্ছেন। গ্রামের দরিদ্র মানুষরা এই 'টং' তৈরী করে থাকেন।

— 'গহন বনে শুনে রহিম নারী কণ্ঠস্বর।
এক লম্ফ উঠে রহিম টংগের উপর।
দাদা দাদা বলিয়া আয়ষা রহিম পানে ধায়।
টং-এর নিকটে গিয়া আয়ষা দাদা পানে চায়।
কে ডাকে দাদা বলি ঘোর বন মাঝারে
তলোয়ার হস্তে রহিম টং থাকিয়া নামে।

বাঁশের ব্যবহার শুধু ঘর-বাড়ীর ক্ষেত্রে নয়, বাঁশকে মর্যাদা সহকারে মদনদেবতার প্রতীক হিসেবে উত্তরবঙ্গে পূজা করা হয়। এ কথা জানতে পারি যে "চৈত্র মাসের মদন চতুর্দশী তিথিতে রতির দেবতা মদনকাম পূজা উপলক্ষে লম্বা লম্বা (২০ ফুট থেকে ২৫ ফুট) বাঁশের মাথায় চাম: বেঁধে বাঁশগুলোকে লালশালু কাপড়ে মুড়িয়ে তুলসী তলায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। কোথাও বা বাড়ির বাইরের উঠোনে এই বাঁশ প্রোথিত করে পূজো দেওয়া হয়"।[২]

'রাজধারী' লোকনাটকে রাবণের সিংহাসন বাঁশ দিয়ে উঁচু ক.রে তৈরী করা হয়। অতি দরিদ্র মানুষের ঘরে বাঁশ যেমন প্রয়োজন গ্রামের ধনীলোকের বাড়ীতেও বাঁশ ঠিক তেমনি প্রয়োজন।

'বিষহরি পালায় বেহুলার কথায় গোদার বাড়ীর বর্ণনায় বাঁশের বেড়ার কথা আছে। সেই বর্ণনাতে গোদার শ্রেণী-চরিত্রও ফুটে উঠেছে। বেহুলার কথা — 'ও গোদা বলতো তোমার বাড়িটা কেমন।'

উত্তরে গোদা বলেন — "ও কন্যা চার পাকে নাই চাটি মাঝিয়াত নাই মাটি। ও কন্যা থাকিয়া মুই দেকং স্বর্গের তারা হে।

'চাটি' অর্থে বাঁশ দিয়ে তৈরী হাল্কা বেড়াকে বোঝায়। গোদার ঘরের মেঝেতে উঁচু করে মাটি তোলাও হয়নি। প্রান্তিক চরিত্র। তাঁর মাছ ধরার জাল নেই। ছিপ দিয়ে মাছ ধরেন। তাই বিক্রি করে বৌ-এর জন্য শাঁখা কিনে নিয়ে যান। গীতের মধ্যে সেই কথাই পাই —

"ন কাহন ছিপ গোদার ছালা খানেক সুতা আর ন কাহন ফলিতা।
গোদার বড় ঠাটরে গোদার বড় ঘাট।
মাওগের পাটানী গোদা টেরিয়া বান্ধে পাক।
হাড়িয়া খলই লইল গোদা কমরে বান্ধিয়া।
মৎস মারিতে চলে গোদা ত্রিপানী লাগিয়া।
প্রথমে গাথিয়া দিল ডাং বোল্লার টোপ।
সাগরে চান্দা মাছ খায় গোটা গোটা।
শাল শোল মারে গোদা ডাঙাতে ফেলায়।

আহেলা ডারিকা মারে গোদা খলইতে ভরায়।

শাল শোল মৎস খাইতে বড় মজা।

আহেলা ডারিকা বেচয়া হাতের কিনে শাঁখা।''

খাল-বিল-নদী জলাশয়ের মাছগুলির নাম পরিচিতি লোকায়ত ভাবে চলে এসেছে। মাছের নাম দিয়ে অসংখ্য গ্রামের নাম রয়েছে। শোলমারি, বোয়ালমারি, শালবাড়ী, ডারিকা মারি — গ্রামের এই নামগুলি এক সময় মাছের প্রাচুর্য্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'নটুয়া' পালার একটা চালু কথা বা ফাকড়ীতে মাছের কথা পাই —

'ঠনা বোলায় ব্যানা,

ট্যাংনা গীদায় গীত

দরই মাছের নাচন দেখি

ওংগি না পায় থির।

শোল মাছের গিবির গাবার

শাল মাছের হুরা

মাথা সটকায় দিচে

পানির তলের দুরা।'

খাদ্য দ্রব্যের তালিকায় ছোট-বড় সব মাছই দেখা যায়। 'বিষহরি' লোকনাটকে বাসর ঘরে বেহুলা রান্না করেন।

'প্রথমেতে আন্ধে বালি শাক-সুগ বরা ভাজা।

চুচুরা মৎস আন্ধে বালি দিয়া বাঁশের গাজা।

রন্ধন আন্ধে সুন্দরী রন্ধনের জানে ভাও।

ঘৃতেতে ভাজিয়া তোলে কৌতরের ছাও।

রন্ধন আন্ধে সুন্দরী কানের নড়ে সনা।

তৈলতে ভাজিয়া তোলে শলমাছের পহনা।

নদীর খাটিয়া মৎস বেছে হালী হালী।

তাক দিয়ে আন্ধে বালি কোয়াসের জালি।

বোয়ালী মৎস আন্ধে তার নিকিলায় কোল।

অধ্যেক করে খাটা অধ্যেক করে ঝোল

বানিয়ার বৌ বানিয়ার বৌ রন্ধন ভাল জানে।

চেং মাছ পুড়িয়া বালি জামুরী দিয়া সানে।

বোয়াল মাছ, চ্যাং মাছ কিংবা শোল মাছের 'পোনা'-র কথাই নয়, খাদ্য দ্রব্যের তালিকায় উঠে এসেছে লোক-সমাজের আরো খাদ্যের কথা। কচি বাঁশের মাথা থেকে গজিয়ে ওঠা সাদা অংশ এলাকার মানুষের সুস্বাদু খাবার। কবুতর বা পায়রার মাংস, কলাইয়ের বড়া ভাজা, লেবুর রস দিয়ে পোড়া চ্যাং মাছের সানা — সবই উঠে এসেছে বেহুলার রান্নায়। ধনপতি চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ বেহুলা এখানে বাসরঘরে কৃষক বধূ হয়েই রান্না করেন। তখন দেখা যায় এই লৌকিক জীবনের ছবি। আবার অভাবগ্রস্ত মহিলার খাবারের বস্তু দেখা যায় 'চোর-চুন্নী' পালা নাটকে। অভাবের ফলে চোরের স্ত্রী চুন্নী চোরকে বলছেন — ও তোর দুঃখ বারমাস। ওরে কতই মুই কাটিয়া আনিম আলির কচুশাক। সাধারণ গৃহস্তের বাড়ীতে বিশেষ দিনে বা কোনো উৎসবে পাঁঠার মাংস খাওয়ার প্রচলন আছে। 'জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই' পালায় বগুলা গোঁসাই পটপুটিয়াকে দীক্ষা দেওয়ার সময় বলছেন —

দিলাম তোকে গোপাল ভাং
দিলাম ঝোলা মালা
হাঁস পারো কাটা ছিড়া
এইলা খাতে মানা।

বৈষ্ণব হয়ে গেলে হাঁস বা পায়রার মাংস খাওয়া চলে না। কিন্তু পটপুটিয়া পাঁঠার মাংস দিয়ে ভাত খেয়ে এসেছেন —

"সেবা বাড়ীত যায়া
মোর পাটাভাত খাওয়া শ্যাস।"

পেঁয়াজ দিয়ে পান্তা ভাতের কথা এই নাটকের এক জায়গায় পাওয়া যায় —

'ঠাকুর বাড়িত ঐল্যা সাধু
করেছে গীতা পাঠ
সকাল বেলায় পিঁয়াজ দিয়া
খাছেন পান্তাভাত

এই পান্তাভাত অবশ্য প্রতিদিন ভালো লাগে না। সে বিষয়টি উত্তর দিনাজপুরের 'খন' পালা নাটকের হরিহরের মুখে শোনা যায় — "মুই পাথারত হাল ধরি যাহু। তুই টপ করি খরাক ধরি যাবু। গরম গরম ভাত নিগাবু। পতিদিন ঠটরা পন্তা ভাল নাগে নি।" গ্রামীণ পরিবেশের উপযোগী খাদ্যদ্রব্যের বিচিত্র বর্ণনা লোকনাটকগুলির চরিত্রের সংলাপে এবং গীতে হয়েছে প্রতিফলিত।

'রাজধারী' লোকনাটকে গ্রাম-বাংলার লোক-চিকিৎসার ব্যবস্থাকে দেখা যায়। রাবণ-ভগ্নী সূর্পনখার

নাক-কান কাটা গেলে গ্রামের ওঝাকে ডেকে এনে চিকিৎসা করানো হয়।

"অঝা — এ সর্বনাখা, তোর যে নাকটা কাটা গেল এনোং করি। রোভো না অউসত লাগাবো।

সর্বনাখা — আউসত ছে না কিতেরে, ছে তে দে।

অঝা — ছে, একখান কাটা ঘাউয়ার ঔষদ জামরির রস, বাঘ মরচি আর নুন এখেটে বেনালছে। যেদি এইখান লাগা দেবি আলায় খরখরা হয় যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

সর্বনাখা — দে দে লাগায় আউসতখান।"

লোক-চিকিৎসক ওঝা এবং সূর্পনখার পরস্পর কথার মধ্যে গ্রামের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আমরা বুঝতে পারি। সেই সঙ্গে দেখি চিকিৎসকের সঙ্গে লোকসমাজের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক।

নারীদের সামাজিক অবস্থানের চিত্র এই লোকনাটকগুলিতে দেখা যায়। প্রত্যেকটি পালায় নারী চরিত্রের ভূমিকা লক্ষ করার মতো। দোতরা পালার 'আলম সাধুতে' বেগমের স্বামী-নির্ভরতা, ধাইমার অভাবজনিত স্বভাব, আয়েষার যৌবন-বেগে ভেসে যাওয়ার আচরণ — এই বিষয়গুলি লোকসমাজে নারীর অবস্থানকে চিহ্নিত করে। সাধারণ নারীর মতো বেগম বাদশাকে বিদেশ যাত্রায় সচেতন করেন। পরনারীর প্রলোভনে যাতে বাদশা না পড়েন সে কথাই গানে বলছেন —

"ওহো প্রাণ সাধুরে সাধু
যদি সাধু বানিজ যান
নিজের হস্তে সাধু রান্ধি খান ওরে
দাড়ি মাঝি সাধু রাখেন সাবধানেরে
কোচাত করি সাধু না করেন ব্যায়
পরনারী সাধু আপন নয়রে
পরনারী সাধু বধিবে জীবনরে।"

নারী-সমাজের প্রতি অবহেলার চিত্রও পাই এই দোতরাপালায়। নারী অনেক সময় সর্বনাশের মূল, এ ধরনের সমাজপ্রচলিত বিশ্বাসেও দেখা যায় দোতরাপালার 'আলম সাধু' লোকনাটকে। আলম সাধু বাণিজ্যযাত্রাকালে পুত্র রহিমকে তাই নির্দেশ দেন —

"গর্ভবতী তোর মাক ছাড়িলাং নাটমন্দির ঘরে।
তোর মার উদরে যদি ভাই পয়দেশ করে।
লক্ষ টাকা দান দক্ষিণা করিবু বসি দ্বারে।

তোর মার উদরে যদি বৈনি পয়দেশ করে।
সে বৈনিক কাটিবু, না রাখিবু ঘরে।''

আবার পাশাপাশি 'জ্ঞানবাল পটপুটিয়া গোঁসাই' শাস্তরী পালাগানে নারী তাঁর স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। নারী ব্যতীত সামাজিক এবং আধ্যাত্মি চেতনার বিকাশ সম্ভব নয় পটপুটিয়া গোঁসাইকে যুক্তি দিয়ে জ্ঞানবালা বাধ্য করেছেন তাঁর কথা মেনে নিতে —

''ঠাকুর, আগে সাধন কর নারী
নারী সাধন না করিলে
না হও বোষ্টম বৈরাগী।
না জানিলে নারী তত্ব
পুরুষের যে পরমাত্মা
সবে নিবে কাড়ি
তার আগে না হও বোষ্টম বৈরাগী।''

'লোভী জোতদার' লোকনাটকে চালাকিশ্বরী স্বামী প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখেন। কিন্তু পারিবারিক চিন্তা ভাবনায় চালাকিশ্বরী নেতৃত্ব দেন। এমন কি নিজের ছেলেও সেখানে গৌণ হয়ে যায়। 'খন' লোকনাটকে হরিহর স্ত্রীকে প্রহার করলেও শেষ পর্যন্ত দুর্গা (স্ত্রী) যুক্তি-তর্ক এবং বুদ্ধিমত্তায় সফল হয়ে ওঠেন। উত্তরবাংলার রাজবংশী অধ্যুসিত এলাকায় নারীদের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার একটা ক্ষেত্র রয়েছে। যেখানে নারীরা হেরে যাচ্ছেন সেখানে অন্তত প্রতিবাদ করেন। কৃষি-সমাজ ব্যবস্থায় ফসল উৎপাদনে নারী-পুরুষের অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে এরকম ভাবনার বিকাশ হতে পারে বলে মনে হয়।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পর যুক্তি তর্কে পরিবারের এবং সমাজের কথা বলা 'চোরচুন্নী' ও 'গম্ভীরা' লোকনাটকে দেখা যায়। 'চোর-চুন্নী'তে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের একটি গীত উল্লেখ করা যেতে পারে।

চুন্নী — 'চরা তুমি আমার আমি তোমার
এই কথা না জানে কায়।
ওরে সঁপি দিলাম মন প্রাণ যৌবন,
তব রাঙ্গা পায়।
আ-হা-র দুই চার কথা জিজ্ঞাসি তোমায়
চরা বলগো আমায়, ওরে তমায়

আমায় কি সম্বন্ধ
বড় হমো কায়।
এইটা কথা বলগো আমায়।

চোরের উত্তর — আ-হা-র তুই হলো চুন্নীগে
আমি বলি যে তোমায়
ওরে স্ত্রী-পুরুষ গুরু-শিষ্য, সখা ভাবো হয়।
এই সমস্ত জানালাম তোমায়।

চোর-চুন্নী পালাতে শুধু অভাব-কষ্টের কথাই বড় নয়, নারী-পুরুষের মধুর সম্পর্কও বড় হয়ে উঠেছে। 'গম্ভীরা'তে সামাজিক এবং পারিবারিক সমস্যা নিয়ে স্ত্রী-পুরুষের অনেক তর্ক আছে। আবার এই লোক সমাজে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনকেও দেখানো হয়েছে।

স্ত্রী — আমি তোমাকে বিয়ে করে মরলাম জ্বলে পুড়ে।
না জেনে শুনে বিবাহ বন্ধনে হলাম আবদ্ধ
কত ভাল পাত্র দিলাম ছেড়ে।

পুরুষ — তোমার বাবা এসেছিল বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে।
দিনে শতবার বাবার পায়ে যেত তেল মাখিয়ে।
বাড়ীর মাটি দিয়েছিল বসিয়ে বাবাকে সোজা পেয়ে।
তোমার বাপে মায়ে দিল গছিয়ে।
এমন রণচণ্ডী আমার ঘাড়ে।

স্ত্রী — রিহার্সাল কর গম্ভীরা, তোমার ষাঁড়ের মতো চিৎকার
শিল্পী-বন্ধুদের জন্য চা করে দাও তিনবার।
যেন কেনা দাসী তোমার।
পানের পিকে পোড়া বিড়িতে ঘর করে একাকার।
চলবে না সব ঐ ঘরে সব ফেলব ছুড়ে।

পুরুষ — তোমার ভাই, বোন, দাদা পরিজন আত্মীয় যত।

আমার বাড়িকে করেছে হোটেলে পরিণত।
এখানেই আব্দার যত।
সম্মানের খাতিরে বিছানা ছেড়ে ঘুমাই মেঝেতে।
আমিও দেব এবার বের করে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছোট ছোট তর্ক-বিতর্কের মধ্যে সমাজের চিত্র ফুটে ওঠে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোথাও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনা চোখে পড়ে না। বলা যেতে পারে লোকসমাজের মর্যাদাকে উঁচু করেই দেখানো হয়ে থাকে এই লোকনাটকগুলোতে। লৌকিক জীবনে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবও লোকনাটকগুলিতে দেখা যায়। রাজধারী, রামবনবাস এবং কুশান পালার মধ্যে রামচন্দ্রের কাছে রাবণ নিজেকে সমর্পণ করেছেন। ''গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক চৈতন্যদেব যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন সামগ্রিকভাবে বাংলার সামাজিক জীবনের উপর তা প্রভাব বিস্তার করেছিল।''[৩] 'রাজধারী'তে রাবণের ক্রন্দনরত গানে তা স্পষ্ট —

''এ প্রভু লেহ সীতা তোর হাতে হাতে
আহা মরিরে।
রাক্ষসকুলে মোক করহ উদ্ধার
এ প্রভু রঘু নাথ রে।
এ প্রভু তুইহে মাতা মোর তুই হে পিতা
তুই হে হোলো মোর জনমদাতারে হে
এ প্রভু অভাগিডিয়ার আর কেহ নাই
শুন প্রভু রঘুনাথ রে।

এই নাটক অভিনয়কালে মাঝে মাঝে দেখা যায় মহিলা শ্রোতারা রামের প্রতি ভক্তি নিবেদন করে উলুধ্বনি দিয়ে ওঠেন। আবার দোতরা পালার আলম সাধু এবং সত্যপীর পালায় রয়েছে পীর-পয়গম্বরদের মাহাত্ম্যের কথা। লৌকিক দেবী মনসার কাহিনী নিয়ে বিষহরি পালা। সমাজের যে কেউ পূজা করলেই তার গুরুত্ব পায় না। প্রতিনিধিস্থানীয় মানুষ চাঁদ সদাগর। শ্রেণী-বিভক্ত লোক-সমাজে দেবীর পূজা প্রচারের জন্য চাঁদ-সদাগরের প্রয়োজন। পূজা-পার্বন, ধর্মীয় ভাবনা, পীর মাহাত্ম্য-এগুলো লোকসমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এর সঙ্গে রয়েছে লোকবিশ্বাস এবং যাদু। 'আলম সাধু'তে রহিম সাগরে যাওয়ার আগেই অনেক বাধা-নিষেধের সম্মুখীন হন। রহিম আয়েষাকে বলছেন —

মাথার উপুরা জিটি করে টেঁও টেঁও পঞ্চরাও। আজি দেও সাগরে যাওয়া বাদ দে বৈনি।

"ঐ যে বোলে কয়,
আরে মুতিম মুতিম ডাবরীত
তাও না মুতিম তোর মাথার খাপরিত।"

দোয়ারীর মাথা পেতে দেওয়ার সুযোগের চাইতে নর্তকীরা খোলা মাঠেই ব্যবহার করবেন। দোতরা পালা 'আলমসাধু'তে কিছু প্রবাদ বা জনশ্রুতি দেখি যার মধ্যে নিয়তির পরিহাসকে লক্ষ করা যায়। আয়েষা তাঁর নিজের দুঃখের জন্য অন্যকে দোষারোপ না করে নিজের কপালের কথা বলছেন —

ভালক না কং ভাল্, মোর বিধাতা. মন্দক না কং ভাল্
মন্দ নয় কালিয়ার কলম মন্দ মোর কপাল।'

মূল গায়কের কথার মধ্যেও ভেসে ওঠে জনশ্রুতি।

"সুক-দুঃখ কপালের লেখা মৃত্যু লেখা পায়
যে দিকে মরিবে বান্দা পায় বা হাটি যায়।"

মানুষের সুখ-দুঃখ কাপালে লেখা থাকে। কিন্তু মৃত্যুর কথা লেখা থাকে পায়-এ। লোকজীবনের এই জনশ্রুতি। আবার এই পালায় বাদশা স্বপ্ন দেখে স্বপ্নের ব্যাখা করেন। সেটিও জনশ্রুতি মাত্র।

"স্বপনে অঞ্চলের সোনা খসিয়া জলে পড়ে
নিশ্চয় জানিবে তার গাভুর বেটা মরে।

এ ধরনের স্বপ্নে যুবক-ছেলের মৃত্যু হয় — এই ধারণাটিও সাধারণ লোকের মধ্যে দেখা যায়। 'চোর-চুন্নী' পালা গানেও দেখি প্রবাদের ব্যবহার। প্রবাদের ভেতর দিয়ে শিক্ষা লাভও হয়।

চুন্নী চোরকে বলছেন — "চুরি, দ্বারী, পরার নারী
এই তিনটা কাম অনাচারী।

এগুলি লোকসমাজের গর্হিত কাজ। আবার বহুল প্রচলিত কথা প্রবাদের আকারে চোরের মুখে —

"চুন্নী চোর বিদ্যাটা উত্তম বিদ্যা
যদি চোর না পড়ে ধরা"

সমাজে সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে তত সমস্যা নয় যতটা অসুন্দরী মেয়েদের। এই কথাগুলিও প্রবাদে পরিণত। 'চোর-চুন্নী'তে তা চোরের মুখেই বর্ণিত —

... দেখ বৈনি, গছের শুকান ঠ্যালত পড়িয়া

কাগা কা-কা করির ধইচ্চে।

'জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই পালাতে পটপুটিয়া গোঁসাই বিধবার হাতে খেতে চান না। গুরুর নিষেধ আছে।

পটপুটিয়া — ওই শুনেক মাই জ্ঞানবালা

মোর উপর তুই না হস গোসা

বিধবার হাতে মা মোর

কিছুই চলে না।

লোকায়ত সমাজের কোনো কোনো বৈষ্ণবদের এ ধরনের বিশ্বাস দেখা যায়। লোকনাটকের কুশীলবরা আসরে ওঠার আগে যাদু-মন্ত্রের ওপর বিশ্বাস রেখে কিছু নিয়ম করেন। তেল, জল ইত্যাদিতে মন্ত্র পড়ে তা শরীরে সবাই ছিটিয়ে নেন। দর্শক শ্রোতাদের ধরা রাখা এবং মুগ্ধ করার জন্য মন্ত্রের ব্যবহার করা হয়।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ক্লিং কৃষ্ণ মহেশ্বর

ডাইনে রয় কালী বায়ে হইল যমদূত

কিংবা

আল্লালাগে তাল্লা উঁচুল লাগে ধান্দা

এই মন্তর দিয়া সভার লোকের আঁখ কইলং বন্দি

এই বন্দি যদি ছোটে আল্লা উচুলের সিংহাসন কাঁপে।

বিভিন্ন পালানাটকের দলের মধ্যে কখনো কখনো প্রতিযোগিতা চলে। সেখানে 'বাণ' মারার রীতিও প্রচলিত। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে এরকম যাদু বা মন্ত্রকে কাজে লাগানো হয়। এগুলো লোকনাটকের লোকজীবনের ভূমি থেকে তৈরী।

প্রবাদ-প্রবচন এবং ধাঁধা আমাদের নির্বাচিত লোকনাটক সংকলনে যথেষ্ট রয়েছে। এই প্রবাদ-প্রবচন বা ধাঁধাগুলি অভিনয়কালে বিভিন্ন চরিত্রগুলি নাটকের অংশ হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। সংলাপ চলতে চলতে প্রবাদ-ব্যবহার করে বক্তব্যের অর্থকে আরো সংহত করেছেন। ধাঁধা ব্যবহার করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া বলে মনে করেন অভিনেতারা। সেগুলোকে সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করলে সমাজের বিভিন্নদিকের চিত্র ফুটে ওঠে। সেদিকে লক্ষ রেখে প্রবাদ-প্রবচন বা বাঁধাগুলোকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

'কুশান' পালা গানে দোয়ারীর সঙ্গে নর্তকীদের ঠাট্টা-তামাসা চলতে থাকে। দোয়ারী যাতে নর্তকীদের চরিত্রের কোনো সুযোগ না নিতে পারে সেদিকে সতর্ক থেকে নর্তকীরা দোয়ারীর মাথা পেড়ে দেওয়াকেও এড়িয়ে যান। এরকম একটা বহুল প্রচলিত কথা নর্তকীরা বলে থাকেন —

"ওগে বেটি যদি হয় পরমা সুন্দরী
তা হলে তার ভাবনা নাই।
ওগে কালোমুখী বেটি হলে
জীবনে শান্তি, নাই।"

'বিষহরি' পালাগানে বেহুলা লক্ষ্মীন্দরকে বাসরঘরে প্রবাদের মাধ্যমে বলছেন —

"জীবন মাগিয়া যে বা খেলায় পাশা।
তার মত দেখি নাই, অতি বড় চাষা।

বোকারই জীবন-পণ করে পা া খেলেন। এই ছোট্ট কথায় রয়েছে গভীর অর্থ।

'লোভী জোতদার' খাস পাঁচালী পালা নাটকে জোতদারের পুত্র সন্তান নেই। একটি কন্যা আছে। পুত্র নেই বলে তাঁর দুঃখ —

"একটি পুত্র দেরে আল্লা দুইটি পুত্র দে
কামাই খাবার আশা নাই, মোর মাটি দিবে কে।"

শুধু পুত্র সংসারে রোজগারের জন্য নয় — মৃত্যুকালে পিতার ক্রিয়া করার জন্য পুত্রের বড়ো প্রয়োজন। সমাজের এই ধারণা থেকে প্রবাদটি তৈরী হয়েছে।

লোভী জোতদার-এর শেষ কথা একটি প্রবাদ দিয়ে শেষ হয়েছে।

"ওরে পরার মন্দ করিয়া সুখী হইচে কুনবা জন।
ধর্ম পথে চলিলে দেখিবে নারায়ণ।

প্রবাদটিতে রয়েছে নীতি-শিক্ষা।

ধাঁধা বা শ্লোক দিয়ে ভরা রয়েছে নটুয়া পালা। লোকায়ত ভাষায় এই ধাঁধাকে ফাকড়ী বলা হয়ে থাকে। উধব-মাধব মূল গীদালকে প্রশ্ন করছেন। প্রশ্নের ভাষা ধাঁধা বা শ্লোক দিয়ে প্রশ্ন।

ক্ষুদ্র বর্ণ বিত্ত (জিনিস) নাল বর্ণ দেহ
ছেলিবা ছেলিবা সর্ব অঙ্গ ধরে
অধিক করি খাইলে
তোর মুখখান গন্ধ করে।

মূল গীদাল উধব-মাধবকে বলেন, এর উত্তর পেঁয়াজ। আবার উধব প্রশ্ন করেন —

জন্মিলে শ্বেত বর্ণ

পরে হয় কালো

লাফে লাফে আহার ধরে

সেইত বিড়াল নয়

আহার ধরিয়া না করে ভইক্ষণ

বলতো গীদাল

এটা কোন জন।

মূল গীদাল উত্তর দেন 'ফিকা জাল'। মাছ ধরার জালের কথা মূল গীদাল উধবকে বুঝিয়ে বলেন। এই ধরনের শ্লোকের মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। লোকসমাজের সঙ্গে বিষয়গুলো যুক্ত। আরো দু'একটি শ্লোক বা ফাকড়ি উল্লেখ করা যেতে পারে —

ঠাকুরঝি ভিটিস কইরলো কি

আখাত ছবা দিছু কাঁঠালের বিচি

দুই একটা মাথা হামার ভিতি

এই জুয়াই বেটা

ওখান মোর বাও।

তোমার যদি ওখান বাও

তাহলে তোমরা খাও।

বায়ুনির্গমনের শব্দকে চাপা দেওয়ার জন্য শাশুড়ি উনুনে কাঁঠালের বীজ পোড়ার শব্দের কথা বলেন। জামাই কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। জামাই-শাশুড়ির মজার ব্যাপারটাই এই শ্লোকের মধ্যে ধরা পড়েছে।

উধবের প্রশ্ন — শাল বাড়িত ছিলো বীরটা

য্যালা ধরিল বীরটা

বেটি ছাওয়ার পাছ

স্যালা বীরটা ফুকুরদুম ফাকাশ।

মূল গীদাল উত্তরে 'ছাম'-এর কথা বলেছেন। শাল কাঠ দিয়ে তৈরী 'ছাম'। ধান ভাঙ্গার জন্য 'ছাম-গাইন' কোচবিহার-জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি এলাকার গ্রামাঞ্চলে মহিলারা ব্যবহার করে থাকেন। সেই ছাম-গাইনকে শ্লোকের মধ্যে দেখানো হয়েছে। এই ধাঁধা বা শ্লোকগুলোতে বাইরের যেমন একটি রূপ আছে ভেতরে আর একটি অর্থ লুকিয়ে থাকে।

প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা বা শ্লোক ইত্যাদিতে দেখা যায় সমকাল পরিবেশ-পরিস্থিতির চিত্র। ''প্রবাদের ব্যবহারিক অর্থ জানতে হলে পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে হয়। প্রবাদ আমরা প্রতিদিন কথায় কথায় ব্যবহার করে থাকি। কোন্ পরিস্থিতে, কখন এবং কিভাবে প্রবাদ ব্যবহৃত হয় সেটি না জেনে প্রবাদের গূঢ় অর্থ উপলব্ধি করা সহজ নয়।''[৪]

লোকজীবন থেকে উঠে এসেছে এই প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা বা শ্লোকগুলি।

বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে বিয়েতে পণ দেয়া-নেয়া কিংবা উপহার সামগ্রী পাওয়া এটি সাধারণ ব্যাপার। এ বিষয়গুলির টুকরো টুকরো ছবি আমাদের সংকলিত লোকনাটকগুলিতেও প্রতিফলিত। যে লোকনাটকগুলির কাহিনী চলমান ঘটনা নিয়ে তৈরী হয়ে থাকে সেখানে বর্তমানের বিষয়গুলি পরিষ্কার ভাবে ফোটে। 'চোর-চুন্নী', 'খন', 'গম্ভীরা', 'খাস পাঁচালী', 'লোভী জোতদার' — এগুলিতে আছে বর্তমানের পণ দেয়া-নেয়ার ছবি। মঙ্গলকাব্য বা পুরানো কাহিনী নিয়ে যে লোকনাটকগুলি আছে সেগুলোতে পণপ্রথা হিসেবে নেই। বরং কন্যাপণের কথা আছে। ''এক সময় এই বাঙ্গালী সমাজেই কন্যাপণ প্রচলিত ছিল।''[৫] আমরা বিষহরি পালায় দেখতে পাই বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের বিয়েতে বাবা-মা, আত্মীয় স্বজন আশীর্বাদ করছেন। আশীর্বাদের সঙ্গে কোনো উপহার-সামগ্রী দান করছেন। এই উপহার দেওয়াকে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর-দিনাজপুর এলাকার গ্রাম লোকসমাজে 'দান' দেওয়া বলে।

বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের বিয়েতে 'দান' দেওয়ার চিত্র —

''প্রথমে কন্যার বাপ ধান্য-দুর্বা দিয়া করিল আশীর্বাদ।
তারপরে দান করে কন্যার মাও
ধামালী খেলাইতে দিল লক্ষ টাকার নাও।
তারপরে দান করে কন্যার খুড়া।
সোনা-রূপা দিয়ারে বান্দিয়া দিল পুরা।
তারপরে দান করে কন্যার কাকী।
হেটকানে সোনা দিল উপর কানে কাটি।
তারপরে দান করে কন্যার জ্যাঠো।
গরুকেনা দিল সবার থাকি ছোট।
তারপরে দান করে কন্যার আবো।
উঠিয়া না যাসরে ভারুয়া কিছু পাবো।
তারপরে দান করে কন্যার মামী

হাতের খারুখিল খসাইতে চোখের পড়ে পানী।

তারপরে দান করে কন্যার মাসী

দান নাই দক্ষিণা নাই খালি হাসি-খুশী।

বিয়েতে এই 'দান' দেওয়ার চিত্রে লোক-সমাজের মানুষের আর্থিক অবস্থাটিও ফুটে উঠেছে। লক্ষ্মীন্দর বিয়ে করে ঘরে ফিরলে তাকে দেখাতে হয় বিয়েতে কী কী সামগ্রী পেয়েছেন।

সনকা বলছেন — ওরে বাবা লখিন্দর, তোমার শশুর বাড়ীতে কী কী দান পাইয়াছ বাবা ?

লখিন্দর — তবে ভূমি দান পেয়েছি মাতাগো লখিয়ার কান্দর। তার সঙ্গে পেয়েছি মাতা, বেহুলা সুন্দর। আর অনেক দান পেয়েছি মাতা লেখা জখা নাই। দুধু খাইতে পেয়েছি মাতা সম্বন্ধের গাই।

ভূমি, সোনা, অর্থ, গরু — এই সকল দ্রব্য বিয়েতে উপহার হিসেবে পাওয়ার প্রচলন দেখা যায় বিষহরি লোকনাটকে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে এই 'দান' সামগ্রী দাবীতে পরিণত হয়েছে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছে সমস্যাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'চোর-চুন্নী' পালা গানে চোর চুন্নীকে এই সমস্যার কথা জানাচ্ছে —

ওগে খাট পালঙ্ক ছাইকেল ঘড়ি

রেডিওটা দেওয়া চাই।

ওগে এ্যালা হইসে দোসরা নিয়ম

আগিলামতন নাই।

আ-হা-র যাহার ঘরে ঝাকুয়া বেটি

ও তার জ্বালা দিন-আতি

ওগে বেটির দায়ে কত লোকে

বেচাইছে মাটি

বেটিয়ালার নাইসে সুখ শান্তি।

যাদের ঘরে 'ঝাকুয়া বেটি অর্থাৎ অনেক মেয়ে সন্তান আছে তাদের সমস্যা আরো প্রখর। চোর উপলব্ধি করছেন সামাজিক সমস্যার কথা। মেয়েদের বর্তমানে বিয়ে দিতে গেলে ছেলে পক্ষকে কতকিছু দিতে হয়। অন্যদিকে একসময় এই অঞ্চলে মেয়েদেরকেই অর্থ দিয়ে নিয়ে আসতে হতো। এজন্যে 'বেটি বেচিখাওয়া' কথাটির প্রচলন এখনো আছে। ড. সঞ্জীব নাথ মুর্শিদাবাদ জেলার প্রচলিত 'বোলান'-এ এই দৃশ্য দেখেছেন —

"কন্যা বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠলে পিতামাতার চোখে ঘুম থাকে না। শান্তি থাকে না মনে। কিভাবে কন্যাকে পাত্রস্থ করবেন, তা ভেবে ভেবেই অস্থির হয়ে ওঠেন তাঁরা। মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত বোলানের একটি রঙপাঁচালিতে কন্যার বিবাহ উপলক্ষে পিতামাতার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রূপ এভাবে প্রতিবিম্বিত —

"বাবা। দিনে দিনে মেয়ে হয়েছে সিয়ানা,
বিয়ে দিতে পারলাম না।
টাকা যে নাই ঘরে,
কেমন করে বিয়ে দিব চিন্তায় যাই মরে
গিন্নি কিছু যুক্তি দাও মোরে।
মা। টাকা সোনা নইলে বিয়ে, তো হবে না,
এখন কি করি বল না"।

এই সংকট থেকে উদ্ধারের আর কোনো পথ না পেয়ে বাবা সিদ্ধান্ত করেন —

"ঘর বাড়ি বিক্রয় করে,
মেয়ের বিয়ে দিব তারে রাখিব দূরে,
আমরা রব গাছতলায় পরে।"

স্বামীর এ কথা শুনে কন্যার মাতার কণ্ঠে অভিব্যক্ত হয় করুণ আর্তনাদ —

"মেয়ে গর্ভে ধরে এত যে যাতনা,
এ জ্বালা প্রাণে সহে না।"[৬]

পালাটিয়া লোকনাটক খাস পাঁচালী 'দহাই ভাইরে ডিমেন্ড চাহান না' শিলিগুড়ির তরাই অঞ্চলে বহু জায়গায় অভিনীত হচ্ছে। এই পালানাটকের রচয়িতা দুজন। কৈলাশ শর্মা এবং দেবলাল সিংহ। পণ-প্রথার বিরুদ্ধে তাঁরা এই পালানাটকটি লিখে মানুষকে সজাগ করতে চান। তরাই অঞ্চলের রাজবংশী অধ্যুসিত এলাকায় ছেলে পক্ষকে পণ নেবার বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু বর্তমান সামাজিক আবস্থায় এই পণ নেওয়া প্রথাতে পরিণত হয়েছে। সেই আক্ষেপে তাঁদের রচনা 'দোহাই ভাইরে ডিমেন্ড চাহান না'। এই পালা নাটকের একটি ধনী লোকের চরিত্র চক্রধারী। জমিদার পিচাশ রায়ের সঙ্গে চক্রধারী কথা বলছেন এরকম ভাবে —

চক্রধারী — না না দাবী-দাবা কিছু ঠিক হয় নাই। গরীবের মেয়ে শুধু দেখতে শুনতে ভালো তাই বিনা দাবীতে কথা দেই দিসি। তা ছাড়া হামার বাড়ীত কোন অভাব নাই, এককিনায় বেটা এত সম্পত্তি কায় খাবে।"

পিচাশ — "তাই বলে বিনা দাবীতে বেহা। ছিঃ ছিঃ লোকে কি কোহবে। হামাক বিষয়ডা ভালো লাগেলনি। হামা তোমার বেটার জন্য মেয়ে ঠিক-ঠাক করিয়া রাখিচি। সঙ্গে একখান গাড়ী, ফার্নিচার সেট, রঙিন টি.ভি। মোটামুটিভাবে ভরি পাঁচেক সোনা আর হ্যান্ড ক্যাশ কমপক্ষে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা।"

বর্তমান সমাজের পণ দেয়া-নেয়ার ছবি চলে এসেছে আমাদের লোকনাটকের লোকজীবনে। এই চিত্র আরো দেখা যায় 'গম্ভীরা'য়। পণ-প্রথার জন্য অত্যাচার, নারী-নির্যাতন, নারী-হত্যা, ধর্ষণ এসমস্ত কিছু গম্ভীরার বিষয়

হয়ে উঠছে। ডুয়েট পর্যায়ে স্ত্রী এবং স্বামীর গীতে সেই কথায় পরিস্ফুট।

স্ত্রী — তোমাকে বিয়ে করে শখ আহ্লাদ সব গেল চুলাই।
খাটতে খাটতে জীবন গেল তবু সুনাম নাই।
দুঃখেই কাটলো জীবনটাই
যদি টি.ভি. আলমারী পাকা বাড়ী চাও
আমার কথা শোন
অন্যত্র কর বিয়ের ব্যবস্থা।

পুরুষ — নারী নির্যাতন করছে সমাজ বিরোধীর দলে।
কত জীবন যাচ্ছে ভারত পণের কবলে।
লোভ আর নীরবতার ফলে।
তাই নারীসমাজ তোল আওয়াজ ভারত বুকে
রুখতে হত্যা ধর্ষণ পণপ্রথা
সাথে পুরুষ সমাজ তোল আওয়াজ
রুখতে পণপ্রথা
রুখতে নারী ধর্ষণ ড্রাগ মাদকতা।

পণপ্রথার গানে সমাজের আরো জটিল সমস্যার কথা ভেসে উঠেছে। নারী ধর্ষণ, পুরুষের ড্রাগ ব্যবহারের বিরুদ্ধে 'গম্ভীরা' গায়কের দল গীতাভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ করে থাকেন। লোকনাটক লোকজীবনের চিত্রই শুধু নয়, লোকনাটক সমাজ-জীবনের শিক্ষার পাঠশালা।

গ্রাম-বাংলার সমাজ-জীবনের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র এই লোকনাটকগুলেতে দেখা যায়। শুধু ছবিই নয়, আর্থিক সমস্যায় মানুষের পরিকল্পনা কেমন করে নষ্ট হয়ে যায় সেই বিষয়টিও পরিস্ফুট। 'চোর-চুন্নী' পালানটকে চোর এবং চোরনীর পরস্পর সংলাপে সমাজের আর্থিক-চিত্র অত্যন্ত পরিষ্কার।

চোরের গীত — ওগে দেশের অভাবে পেটের ভোকে
লজ্জা সরম করিনু নাশ।
ওগে মনের দুঃখে মাটির টুকরি
মাথাত উবাস

চুন্নীর গীত — ওরে নানান কথায় জ্বলে দেহা
অন্তরে মোর নাইরে সুখ

ওরে মনটা কছে দশাপরাটার
ফিরিয়া না দেখ মুখ।
আহারে যেই হাতে বিয়ারে হইছে
ওদিন হাতে মোর দিন যাছে কাচালে
খাবার বাদে নাই মোর শান্তি
যেমন অন্তর জ্বলে দিন যাছে
মোর কাচালে গে।

অর্থের অভাবটাই এখানে বড়। তার থেকে তৈরী এই সমস্যা। জমিহীন মজুর শ্রেণীর লোক চোর-চুন্নী। চুরী করতে গেলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে চোর। বিভিন্ন উপায়ে মানুষের রাত জেগে পাহারা দেওয়ার ফলে চোরের চুরী করতে অসুবিধা। সমাজের এই অবস্থার কথাগুলোও গীতে প্রকাশিত।

''আহার যেমন হইসে আজি পার্টিলা
চুন্নী দেছ পহরা
ওগে কেমন করি যাইগে চুরি করিবার
চপর রাতি আছে পহরা।''

''বৃত্তিই যার চুরি করা, রাত্রে তাকে ঘর ছেড়ে বাইরে যেতেই হবে।''[৭]

পুলিশের হাতে চোর ধরা পড়লেই পুলিশের বেদম প্রহার-এ কথাও চোর জানেন।

''আহার দারোগাবাবু রাগ করিয়'
মোক কছে ক্যান করলু চুরি গিয়া
মুই কছো, নাই করো মুই চুরি
ওরে এটা কথা শুনি য্যালা
ঝাঁপি উঠিল সিপাইগিলা
ওঠাইল পিটের দুরদুরি
কি কাম কোনু জান হারানু
করিয়া চুরি।''
আহ'র থানার পছিমা নিয়া যায়া
নাকে মুকে দিলেক মুতি
চিপিয়া ধরিয়া টুটি

কি কাম করিনু জান হারানু
করিয়া চুরি।

থানাতে পুলিশের শাস্তি দেওয়ার কথাও চোরের মুখে বিবৃত। অভাব-কষ্টের জন্য নিরুপায় চোরকে চুরি প্রথাকে অবলম্বন করতে হয়। সরকারী সুযোগ-সুবিধা যেখানে গেলে পাওয়া যায় যেখানেই চোর জীবন বাঁচাবার আশায় ছুটে যান। 'ইন্দিরা আবাসন'-এর জন্য বি.ডি.ও. অফিস, প্রধানের বাড়ী, রেশন-ডিলারের সঙ্গে দেখা করা সবকিছুতেই চোরকে ছুটতে হয়।

"ওগে প্রধান অধ্যক্ষ মেম্বার কের্ণী
সগায় তো ভাই গেলেক চলি
বি.ডি.ও. আসিবে নয়া হাট
ওগে চট করিয়া খাবার দেগে নোয়া যাবে না।"

রেশন কার্ডের গুরুত্ব চোর বোঝেন। তাই সেটাকে যত্ন করে রাখতে চান।

"ওরে ভাবিয়া দেখেক রেশন কার্ডখান
না হলে কিছুই না পাবেন,
হইসে বড়ই মূল্যবান
ওরে সাবধানে রাখেন
হুখান পেটের খতিয়ান।"

চোরের মুখে শুধু ব্যক্তি জীবনের চিত্রই ফোটে না, ফুটে ওঠে ভারত-বাংলাদেশের এলাকাগত সমস্যা। জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ী অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কিত হয়ে আছে। ভারত-পাকিস্থানের জমি জরীপের সময় থেকে এই অঞ্চলটিকে 'ছিটমহল' বলে চিহ্নিত। বর্তমানে সেই এলাকার বসবাসকারী মানুষ বাংলাদেশ কিংবা ভারত কোনো সরকারের দ্বারাই ঠিকমতো নির্দিষ্ট হচ্ছে না। এই সমস্যাটি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলেও আলোচনা চলছে। বিষয়টি চোরের মুখে গীতের আকরে প্রকাশিত।

"আহার শুনো ভাইরে ও ভারতবাসী
তোমরা করিয়া বিচার
ওরে জরীপ করেছে নাভিস্থানটা
ঐ ভারত সরকার, পঞ্চ অক্ষর করিলেক তৈয়ার"

এরকম সামাজিক সমস্যার কথা কম বেশী প্রায় সব লোকনাটকে দেখা যায়। তবে চোর-চুন্নী এবং গম্ভীরা পালায় তা রয়েছে তীর্যকভাবে। দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কথা আছে গম্ভীরায় —

"৫৩ বছর অতিক্রান্ত ভারতবর্ষ স্বাধীন
দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া, মানুষ কর্মহীন।
কাটছে দিন অর্ধাহারে অপুষ্টিতে শিশু মরে
বহু গ্রামে পানীয় জল নাই, মরছে বিনা চিকিৎসায়।"

সমাজ-উন্নয়নে যাঁদের কথা সচরাচর শোনা যায় সেই সকল মানুষের মধ্যেও নানারকম দুর্নীতি আশ্রয় নিয়েছে। তাঁদেরকে সজাগ করতে গম্ভীরা গান তৈরী হয়।

গম্ভীরার উচিত বক্তা — "জনদরদী নেতা, তোদের ক্ষুরে নমস্কার,
গদীর লোভে আর নিজেদের স্বার্থে
যত ভাষণ চিৎকার।
রাজনৈতিক ডুগডুগির তালে নাচে
এই বানরের যদি ভয় হয়রে তাল
হবে ডাল ভাঙ্গা বানরের হাল
শ্রমিক মাঝে দাঙ্গা লাগায়
তোদের মত নেতারাই
মারামারির সময় তোদের
পাত্তা নাই।"

দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ, ঘুষখোর, ছিনতাইকারী, ধর্ষণকারী, পকেটমার, সাইকেল-চোর, বেআইনী মদ-বিক্রেতা সমাজের নানা শ্রেণী মানুষের কর্ম-কলাপের প্রতিফলন ঘটে গম্ভীরার মধ্যে।

পকেটমারের কথা — "মাত্র দুই অঙ্গুলে
সংসার চলে।"

ঘুষখোর নিয়ে গম্ভীরা — "সাঁইবাবার কন্যা হলে
সোনা দানা চাকরী মিলে
ইঞ্জিনীয়ারকে দিল উপহার
হাত ঘুরিয়া সোনার হার
মন্ত্রীযন্ত্রী ছিল যত
অলৌকিক ঘটনায় অভীভূত
কবাজীর ধান্দাবাজী আর কার সাথী

ধরা পড়ল টি.ভি. ক্যামেরায়।"

সবসময় পুলিশের কাজ ঠিক হয়ে ওঠে না। তার ফলে সাধারণ মানুষ লাঞ্ছিত হয়।

"রাতের বেলাই চোর ছিনতাইয়ের ডর।
তার চাইতে পুলিশ ভয়ঙ্কর।
বিনা দোষে লিছে ধর‍্যা।
ডাকাতি কেসে দিছে ভর‍্যা।
নিরপরাধি ফাঁসছে বহু এমন।
চাল, ডাল, তেল, চিনি, কেরোসিন
বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে প্রতিদিন
সুরক্ষা আরক্ষার মদতে
চোরাকারবার চলছে জেলাতে
ধন্য তোদের পুলিশ প্রশাসন।

গম্ভীরা লোকনাটকে সমাজের প্রশাসনের মানুষদের কাজ-কর্মের চিত্র ধরা পড়ে। ছিনতাইকারী, সাইকেল চোর, বে-আইনী মদবিক্রেতার জীবনের গতি-বিধি গম্ভীরা শিল্পীদের চোখ কখনো এড়ায় নি।

"হায় কি হলোরে, কি করবো রে
কি করি উপায়ই।
জমি বেচালু বিশ হাজার টাকা
হয়্যা গেল ছিনতাই।"

যেখানে সেখানে মদ বিক্রী হচ্ছে। এই ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে গম্ভীরার সজাগ দৃষ্টি —

"হাসপাতাল, স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড চত্বরে
বিনা লাইসেন্সে মদ বিক্রী করে
পুলিশ যখন আইন ফলায় এই মদের ব্যবসায়
দু'গ্লাস মদে বন্ধ হয় গর্জন।"

গম্ভীরা লোকনাটকের শুরু সামাজিক সমস্যা দিয়ে। তাই প্রস্তাবনাতেই আমরা দেখি মানুষের সমস্যা —

'হায় কি হলোরে, ওকি করবে রে, কি করি উপায়
বুড়াতি কালে প্যাটে পাথর
অপারেশনের টাকা নাই

অথবা

'আমি ব্যবসা করে পাড়ার খরিদ্দারে
পণ্য দিলাম ধার, দোকান গেল রসাতলে
চোখে দেখি অন্ধকার।'

এই সমাজ-সমস্যার কথা 'শিব'-কে আহ্বান করে এনে বোঝানো হয়।

''শিব হে ঃ—
স্বাধীনতার স্বাদ বড়ই তিতা দিন কাটছে অনাহারে শিব হে
কোটি কোটি টন খাদ্য শষ্য পচছে গুদাম ঘরে
বাজেট পাশ একবার বছরে মূল্য বৃদ্ধি বারে বারে।
চাল গম, তেল রেশনে চড়ছে দর দিনে দিনে
থ্যাকা থ্যাকা রেশন ভাগ্যে জুটে না।''

প্রস্তাবনা, বন্দনা, চারইয়ারী, ডুয়েট, টনটিং রিপোর্টিং গম্ভীরার প্রত্যেকটি পর্য্যায়ে সমাজ-জীবনের নানাছবি উজ্জল হয়ে ফোটে। লোকনাটকের নাট্যাভিনয়ের অভিনেতারা অধিকাংশই কৃষিজীবী। তাই কৃষকদের সমস্যা, জমির অধিকার, ভাগ-চাষীর আন্দোলন, বেনামী কৌশলে জমিদারের জমি-রক্ষার চক্রান্ত ইত্যাদির কথা ঘুরে ফিরে লোকনাটকগুলিতে এসেছে। 'কুশান' পালানাটকে দেখি কালনেমির সঙ্গে রাবণের লঙ্কাভাগের বিষয়ে জমি-বন্টন সমস্যা। কালনেমি রাবণের কৌলশ বুঝতে পারলে রাবণ খুব রেগে ওঠেন। রাবণ চরিত্রটি তখন শোষক জমিদারের মতো হয়ে ওঠেন। প্রজার উপর অত্যাচার করতে কুণ্ঠিত হন না। রাবণ কালনেমিকে বলে ওঠেন — ''তুই বেটা মোর মামা, না মোর শত্রু। মন্ত্রী, দ্যাওতো মোক ঐ হাতিয়ারখান। ব্যাটাকে একেবারে শ্যাষ করি দ্যাম।'' এ যেন বর্গা অপারেশনের সময় বর্গাদারের বিরুদ্ধে জোতদারের আক্রমণ।

পালাটিয়া মান পাঁচালী 'দস্যু রাণী কালিন্দী' পালায় কিষণলাল রাজার বিরুদ্ধে কৃষকদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরেন — ''মহারাজ এই ক্ষুধার দিনে না খেয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে, খাজনা দিবে কি করে। খরায় কয়েকবৎসর জমিতে ফসল ফলাতে পারছে না। খাজনা দিবে কি করে মহারাজ।''

মহাজনের টাকার শোধ দেওয়ার ক্ষমতা নেই কৃষকদের। ফসল না হওয়ার জন্য খাজনা দেওয়াও সম্ভব নয়। কৃষকদের এই করুণ-অবস্থা অন্য নাটকগুলোতও রয়েছে। খাস পাঁচালী 'লোভী জোতদার' পালা নাটকে জোতদার সরকারের হাতে উদবৃত্ত জমিকে খাস জমি হিসেবে তুলে দিতে চান না। জোতদাররা প্রয়োজনে 'ঘরজামাই' রেখে মেয়ের নামে জমি রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এরকম সামাজিক চিত্র রয়েছে 'লোভী জোতদার' পালা নাটকে।

নাটকে মেয়ে দুলালীর প্রতি জোতদারের কথা — ''দেখমা আজি হাতে এইলা ঘরবাড়ী সয়-সম্পত্তি তামানলায় তোর। তুই নিজে এইল্যা দেখা-শুনা করিবো। আর বাবু (জামাই), বেহাই বেহানি তমহার ঐডা বাড়িত ঘরদুয়ার ভাঙ্গিয়া সগায় এইঠে আসিয়া রহন। আর মড়ল, তুই আগত যেনং ছিলো তেনংয়ে এই জমি জিরোইতলা দেখাশুনা করিবো।''

জমির ফসলের ভাগসত্বকে কেন্দ্র করে আধিয়ারদের আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের জানা আছে। উত্তরবঙ্গে তে-ভাগা আন্দোলন দিনাজপুর জেলায় প্রথম সংঘটিত হয়েছিলো। এই তে-ভাগাকে কেন্দ্র করে লোক কবিরা অনেক গান বেঁধেছেন।

''একে একে বলে যাই শোনেন বন্ধুগণ
খাঁপুর যুদ্ধের কথা করিব বর্ণন
১৩৫৩ সাল মাঘ মাসের
তেভাগার রণে কৃষক শেষ কুদ্দিল মাহামান্য
ভালকা বাঁশের ধনুক নিল হস্তেতে তুলিয়া
চোখা চোখা তীর নিল পৃষ্ঠেতে বাঁধিয়া
দলে দলে কৃষক সাজে বলে মার মার
কোমর বান্ধিয়া সবে হৈল তৈয়ার
ঘুটঘুটি আন্ধার রাতে ম্যাঘের ঝড়ে পানি।
জালিমে এই রাতে বুঝি করিবে দুশমনি।''

দিনাজপুর জেলার অধীনে খাঁপুরের ঐতিহাসিক বীরত্বপূর্ণ তেভাগা লড়াইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং খাঁপুরের তে-ভাগা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক কমরেড কালী সরকার রাজসাহী সেন্ট্রাল জেলে বন্দি থাকাকালীন ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল এই জংগানটি রচনা করেছিলেন।[৮]

এই 'তেভাগা' নামে 'খন' রচিত হয়েছে। 'তেভাগা' খনে জোতদার এবং পুলিশের অত্যাচারের বর্ণনা রয়েছে। এই লোকনাটকে জমিদারের নায়েব দয়াময়ের কথা — ''কি, সর্বনাশ, আধিয়ার করছে ফসলের তে-ভাগার দাবী। বেটারা উসকানীতে এইসব করছে। এই দাবী তাদের ন্যায় নয়। পুলিশ দিয়ে বেটাদের ঠেঙ্গাতে হবে। লাঠি চলাও গুলি চালাও। সব নিমকহারামের দল। বেইমান সব বেইমান।''

আধিয়ার উদাসু বর্মণের দাবী —

'' হামরা ভারতের স্বাধীনতা চাই, লাঙ্গল যার জমি তার। আধি জমির সত্ব চাই। আধি ফসলের তিনভাগ চাই। এইল্যা আর কি, আরও অনেক দাবী ছে।''

এই 'তেভাগা' খনে জমিদারের নায়েব, তহশিলদার, মহাজন, জেলখাটা নেতা, আধিয়ার, আন্দোলনকারী মহিলা, পুলিশ, এরকম বিভিন্ন মানুষের নানাবিধ কার্যকলাপের দৃশ্য বিদ্যমান। তেভাগার আন্দোলনের ছবি গম্ভীরাতেও ধরা পড়ে। মালদহের গম্ভীরা গায়ক ও কবি বনমালী কুণ্ডুর রচিত গানে শোনা যায় তে-ভাগার কথা —

"শোনরে ভোলা নানা মাঠে নাইকো দানা
ক্যানে দিলি এমন সাজারে
তোর ভুতের বেগার খাটা
ভাত নাই আধ পেটা
হামার খাচা হইয়াছে
বুকের পাঁজারে।"[৯]

"এটা ঠিকই যে মোটামুটিভাবে প্রত্যেকটি অঞ্চলের লোকজীবনে প্রচলিত নাটকের উপজীব্যগুলি কী, তা সেখানকার মানুষ জানেন।"[১০]

লোকনাটকগুলিতে লোকজীবনের বিচিত্র কার্যপ্রণালী এবং কথা সুন্দরভাবে স্থান পেয়েছে। বলা যেতে পারে লোকনাটক লোকজীবনের দর্পণ।

তথ্যসূত্র

১। ড. গিরিজাশংকর রায়, উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, পৃ: ৫০।

২। সুখবিলাস বর্মা, জাগ গান, পৃ: ২৫।

৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসংস্কৃতি, পৃ: ১৩৩।

৪। ড. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর ঃ পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, পৃ: ৪৫০।

৫। ড. সঞ্জীব নাথ, বাংলার লোকনাট্য ঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, পৃ: ১৭৫।

৬। তদেব, পৃ: ১৭৪।

৭। বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়, গ্রামীণ লোকনাটক : চোর-চুরনীর পালা : বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক, সম্পাদিত সনৎকুমার মিত্র, পৃ: ১৫৫।

৮। ধনঞ্জয় রায়, সম্পাদনা, তেভাগা আন্দোলন, পৃ: ২০৯।

৯। তদেব, পৃ: ২১৪।

১০। পল্লব সেনগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পৃ: ২২৩।